বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩, ০৮ আগস্ট ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমার মা ও জাতির পিতার সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী। জন্মদিনে আমি এই মহীয়সী নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আগস্ট শোকের মাস। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বীর শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো দু'লাখ মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগস্টের শহীদদের।

আজ আমার মায়ের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী। ১৯৩০ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার মাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

হত্যা করে আমার তিন ভাই - ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল এবং দশ বছরের শেখ রাসেল, দুই ভাইয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, রিন্টুসহ আমাদের পরিবারের ১৮জন সদস্যকে।

বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকেও ঘাতকেরা হত্যা করে। আমি সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সুধিবৃন্দ,

আমার মা সম্পর্কে মানুষ খুব সামান্যই জানে। তিনি সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও প্রচার বিমুখ ছিলেন। একদিকে স্বামী-সংসার অন্ত:প্রাণ বাঙালি নারী। অন্যদিকে একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত জনগোষ্ঠীকে মুক্তির চেতনায় উজ্জীবিত করার সংগ্রামে স্বামীর একান্ত সহযোদ্ধা।

খুব অল্প বয়সে মা-বাবা হারানো বঙ্গমাতার মধ্যে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা গড়ে উঠেছিল। যার শুরুটা হয় আমার দাদা-দাদীর কাছে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই ।

বাবাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার মা সহায়তা করতেন। আববা জেলে থাকার সময় তাঁকে দেখতে যেতেন। দলের নেতাকর্মীদের খোঁজখবর তাঁর মাধ্যমেই পেতেন। আববার দিক-নির্দেশনাও মা'র মাধ্যমেই নেতাকর্মীদের কাছে পৌঁছাত। সংসারের পাশাপাশি সংগঠন চালানোর প্রয়োজনীয় অর্থও মা'ই অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ করতেন।

মা ইচ্ছে করলেই স্বামীকে সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধের চেষ্টা করতে পারতেন। আর দশটা নারীর মত ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাতে পারতেন। তিনি তা করেননি বলেই আজ আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। সন্তানরা বঞ্চিত হয়েছি, বেশি বঞ্চিত হয়েছেন- আমার মা। মাকেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে- এটিই ধ্রুব সত্য।

নেপথ্যে থেকে তিনি জাতির পিতাকে সাহস যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আমার মা ছিলেন বলেই আব্বা নির্দ্বিধায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর কারাগারে ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হলে ব্যস্ত থাকতেন আন্দোলন-সংগ্রাম আর সংগঠন নিয়ে।

ভেবে দেখুন, যে পরিবারের প্রধান বারবার জেলে যান-সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর অবস্থা কি হয়? তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়। কেমন সাহস, শক্তি আর মনোবলের জোরে তিনি সংসার পরিচালনা করেন!

ফরিদপুর কোর্টে হাজিরা দিতে এসে দু'জনের দেখা হওয়ার পর আমার মায়ের অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন-''রেনু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, জেলে থাক আপত্তি নাই। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউই নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে? কেঁদেই ফেলল।''

তবে আব্বাও আমার মায়ের সাহস, মনোবল, ত্যাগ, সংগ্রামী চেতনা, বিচক্ষণতা, দুঃখ-কষ্ট সব বুঝতেন। ১৯৫১ সালের ঘটনা। ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনাকারণে কারাবন্দী থাকার পর- 'জেলের বাইরে যাব, হয় জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায়'-ঘোষণা দিয়ে আব্বা অনশন করতে গিয়ে একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছেন। বেঁচে ওঠার আশা ছেড়েই দেন। তাই চারজনের কাছে চারখানা চিঠি লিখেন।

চিঠিগুলো পাঠানোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার মা সম্পর্কে আব্বা তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, ''আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তার কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বারবার আব্বা, মা, ভাই-বোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেনুর দশা কি হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টার অবস্থাই বা কি হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না।''

অবশেষে মুক্তি পেয়ে টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে এলে আমার মা আব্বাকে বলেন, ''কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের কি অবস্থা হত? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হত না? মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কিভাবে করতা?''

সুধিবৃন্দ,

আম্মার উৎসাহেই বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লিখেছিলেন। শুরুতে বঙ্গবন্ধু সে সম্পর্কে লিখেছেন - ''আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বললেন বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী। বললাম লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোন কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।''

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ''আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেনু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেনু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।''

বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে প্যারোলে মুক্তি নেয়ার চাপ দেয়। মা'কে ভয় দেখানো হয়েছিল- পাকিস্তানীদের শর্ত না মানলে তিনি বিধবা হবেন। বঙ্গবন্ধু প্যারোলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তান সরকার আব্বাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ এর ৭ মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যাওয়ার আগে আব্বা বেডরুমে বিশ্রাম নেয়ার সময় মা আর আমি তাঁর সাথে ছিলাম। সেদিন অনেকেই অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার মা বলেছিলেন, 'তোমার মন যা চায় তুমি তাই বলবে'।

২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরই পাকসেনারা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কামাল ততক্ষণে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। পাকিস্তানীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকি।

মাস দু'য়েক পালিয়ে থাকার পর পাকবাহিনী মগবাজারের একটি বাড়ি থেকে আটক করে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই বাড়ির কঠোর নিরাপত্তা ভেদ করে জামালও মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়।

দেশ স্বাধীনের পরও আমরা জানতে পারিনি, আব্বা বেঁচে আছেন কিনা। স্বাধীনের ২২ দিন পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বিবিসি জানায়, আব্বা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

এ সময়টায় আম্মার যে মনোবল দেখেছি, তা ছিল কল্পনাতীত। স্বামীকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে, দুই ছেলে মুক্তিযুদ্ধে, তিন সন্তানসহ তিনি গৃহবন্দী। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন।

অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য নিয়ে মা সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। আর আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। ৭১'র মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় মা অধিকাংশ সময় হাতে তসবিহ নিয়ে পড়তেন।

৭১-এ বিজয় এলো ১৬ ডিসেম্বর। আর আমরা বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলাম ১৭ ডিসেম্বর। সেদিন আমাদের অবস্থা বুঝতে পারেন- রুদ্ধ দ্বার, মুক্ত প্রাণ। দেশ মুক্ত। জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পন করেছে। তখনও আমরা নরকে বসে দেখেছি হায়েনার শেষ কামড়। মা সেদিন পাকিস্তানী হাবিলদারকে ডেকে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'তোমাদের নিয়াজী সারেন্ডার করেছে, তোমরাও করো।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা নির্যাতিতা নারীদের জন্য আমার মা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

বেগম মুজিব ব্যক্তিগত জীবনে কখনই বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি। আমাদেরও তাঁর আদর্শেই মানুষ করেছেন। আব্বা পাকিস্তান আমলে মন্ত্রী ছিলেন। চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

কিন্তু আমার মা সব সময়ই সাধারণ বাঙালি নারীর মতই জীবন যাপন করেছেন। সেকারণে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদান হয়ত লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টোরথে চড়িয়ে দেয়। আজও সে ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। আজকের যে জঙ্গিবাদ তা ৭৫'র জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট একটি বিষ ফোঁড়া।

ঘাতকেরা বঙ্গমাতাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি আজও বেঁচে আছেন ত্যাগের মহিমায় লক্ষ-কোটি বাঙালির হৃদয়ে। তাঁর গুণাবলী ও অসাধারণ মানবিক মূল্যবোধে নতুন প্রজন্ম উজ্জবীবিত হোক - এই কামনা করি।

আজ আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...